PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

স্মৃতির সরণী বেয়ে: নারীর পরিবর্তিত জীবনচর্চা

সৌমিতা মিত্র

অতিথি অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষা বিভাগ এবং নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: smtmitra40@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক-করুণতম অধ্যায়ের নাম দেশভাগ—বাঙালি জীবনের বৃহত্তম ট্রাজেডি। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভারতবর্ষ জুড়ে এক অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুদের জন্য ভারত আর মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান- এমন ধারণা ও সিদ্ধান্ত কয়েক কোটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছিল। দাঙ্গা ও হানাহানিতে নিহত হতে হয়েছিল হাজার হাজার অসহায় মানুষকে। নারী ও শিশুকে। যে কোনো যুদ্ধ ও দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরা। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময়েও প্রচুর নারীকে নির্যাতিত হতে হয়েছিল প্রতিপক্ষের হাতে। শত শত বছর একই সাথে বসবাস করা মানুষগুলো রাতারাতি কীভাবে হিংস্র দানবে রূপান্তরিত হয়েছিল তা দেখে শুধু শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী নয় সদ্য ভারতত্যাগী ব্রিটিশরাও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ভারত ভাগে সবচেয়ে বেশি দাম দিতে হয়েছে পাঞ্জাব, বাংলাকে। কারণ এ দুইটি প্রদেশও বিভক্ত অর্থাৎ ভাগ হয়ে পড়েছিল দুই দেশে। বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে লাখ লাখ মানুষকে। এদের অনেকেই হয়ে পড়েছিলেন ঠিকানাহীন। এক কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছিল। লাখ লাখ মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টে গিয়েছিল। অনেকে রাতারাতি রাজা থেকে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল মানবতা। সে লাঞ্ছনা, অত্যাচার আর ভয়াবহ নির্যাতনের ক্ষত এখনো শুকায়নি পাঞ্জাব ও বাংলার জনগণের মন থেকে। সেই অসভ্যতা, বন্যতা চিরস্থায়ী ক্ষত রেখে গেছে এ দুই জনপদে। উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বহু নারী নির্যাতনের শিকার হয় । ধর্ষণ, অপহরণ প্রভৃতি ঘটনা অবাধে চলে। দেশভাগের ফলে উদ্ভুত ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বেদনাদায়ক বিভিন্ন বিষয় স্বাধীনতা পরবর্তী বিভিন্ন আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। দেশ ভাগের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কীভাবে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন প্রভৃতির শিকার হয়েছে এবং দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তা বিভিন্ন লেখকের লেখায় উঠে এসেছে। দেশত্যাগের সময় অতীতের বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতিচারণ, অনেক বেদনা নিয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু প্রভৃতি বিষয়গুলি বিভিন্ন লেখক তাদের লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন । দেশভাগ কীভাবে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও পরিবার পরিজনর বিভিন্ন সদস্যের সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, কীভাবে বহু প্রিয়জন একে অপরের থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে তা বিভিন্ন আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথায় ফুটে উঠেছে। দক্ষিণারঞ্জন বসু সম্পাদিত 'ছেড়ে আসা গ্রাম' উপন্যাসে দেশভাগের পরিণতিতে উদবাস্তু শরণার্থীদের মানসিক যন্ত্রণা ও বেদনা ধরা পড়েছে।

সূচকশব্দঃ দেশভাগ, নারী, বাঙালি, জীবন, যন্ত্রনা।

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রূপটি যদি দেখতে পাওয়া যেত, তা বোধ হয় হতো প্রচণ্ড এবং নিষ্করুণ। তাঁর সেই সংহার মূর্তির পিছনে হয়তো মঙ্গলবাদ্য বাজত না, বাজত বিষাদসুর, কিংবা যুদ্ধ-দামামা। কেননা, ইতিহাসদেবীই কেবল সাকার রূপে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিতে পারেন, মানুষ নামক প্রাণীটি তার

পাশের মানুষের প্রতি কত চরম অবিচার করতে পারে, কত নির্লিপ্ত নির্দয় উদাসীনতায় এই সুন্দর শোভন বিশ্ববক্ষে নিমেষে বিষাদ ও ভয়ের আবহ রচনা করতে পারে। বারংবার ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটলেও মানুষ তার থেকে শিক্ষা নিতে পারে না। সে কেবল অনিয়ন্ত্রিত উন্মাদনায় সামনের দিকে ছুটে চলে, অবধারিত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। ভারতবর্ষের গত একশো বছরের ঘটনাবলি যেন ইতিহাসদেবীর এই ছবিই ফুটিয়ে তোলে। দেশভাগ বিষয়টি শোকের, উদ্‌যাপনের নয়। এটা অবশ্যই চরম সত্য, কিন্তু তার পাশাপাশি এভাবেও ভাবা যায় না যে সব ধ্বংসের মধ্যেও অতিক্ষুদ্রাকারে ভ্রূণের ন্যায় সুপ্তাকারে থাকে স্বাধীনতার বীজ। দেশভাগের করুণ স্মৃতি যে রকম অস্বীকার করা যায় না তেমনি এটাও তো ঠিক যে বিষাদের মধ্যেও অন্ধকারের মধ্যেও আলোর ক্ষীণ রেখা ইতিবাচক দিকের ন্যায় সদা জাগ্রত থাকে। সুতরাং, অনেক দিন তো আমরা দেশভাগের ট্র্যাজেডি, স্বাধীনতার উদযাপনে মেতে রইলাম। এবার না হয় সমাজের এক বৃহদাংশের অত্যাচারের, যন্ত্রণার যে কাহিনী মানুষ জেনে তাদের প্রতিসমবেদনা, হা-হুতাশ জাগিয়েছেন সেই নারী সমাজের কিয়দাংশের দেশভাগের ফলশ্রুতিতে প্রাপ্ত স্বাধীনতার, স্বনির্ভরশীলতার দিকটাও সমাজের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে দেশ ভাগের ইতিবাচক ক্ষেত্রটা উদযাপন করি।(১)

বরিশালের ফিরোজপুরে জন্ম নেওয়া অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার স্মৃতিরঞ্জন মৃধা ১৯৮৬ সালে লিখেছিলেন, আমার প্রতি ভীষণ নিস্পৃহ আর উদাসীন লাগে তোকে আজকাল।আমার প্রতি ভীষণ নিস্পৃহ আর উদাসীন লাগে তোকে আজকাল। র ্যডক্লিফের কলমের আঁচড়ের দাগ মাটিতে বা জমিতে পড়েনি, দাগটা পড়েছে জন্মসূত্রে দুর্ভাগা এক কোটি এগারো লক্ষ মানুষের বুকের পাঁজরে।' সেই আঁচড়ে 'জন্মভূমি-মায়ের বুকখানা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে।' অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী এবং ১৯৫২-তে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যা মণিকুন্তলা সেন দেশভাগের কথা শুনে বলেছিলেন, 'আমার জন্মস্থান বরিশাল হবে অন্য দেশ, বুক ভেঙে যাবে আমার।' দেশভাগের জন্য মানসিক প্রস্তুতির সময় মেলে না অনেকের। সব কিছু ফেলে কেবল বয়ে নিয়ে আসে দেশছাড়ার হৃদয় মথিত করা বেদনার স্মৃতি। ধানসিঁড়ি, সন্ধ্যা আর কীর্তনখোলা নদীর দেশ বরিশালে জন্ম নেওয়া কবি জীবনানন্দ দাশ হয়তো তাঁদের জীবনের কথা ভেবেই লিখেছিলেন, 'যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের— মানুষের সাথে দেখা হয় নাকো তার।' চলচ্চিত্র নির্মাতা তানভীর মোকাম্মেল বলেন, 'দেশভাগের বেদনার ভাষা আজও তৈরি হয়নি, যে ভাষায় বেদনার এই অতলান্ত গভীরতাটা তুলে ধরা সম্ভব।' ছেড়ে আসা জন্মভূমির জন্য অন্তরের কাতরতা ফুরোয় না কোনও দিন। সে কাতরতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না বলে অনেকে নীরব থাকেন, কেউ বাঙ্ময়। দেশভাগের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা নিয়ে ঊর্বশী বুটালিয়া তাঁর 'দ্য আদার সাইড অব সাইলেন্স' বইটি লেখার জন্য সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন

পঞ্জাবের উদ্বাস্তু মেয়েদের। সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় তিনি লক্ষ করেছিলেন, দুঃস্বপ্নসম অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছিলেন যে সব মহিলা, অধিকাংশই নির্বাক। যদিও কথা বলেন, বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে যান। ঊর্বশী বুটালিয়ার ভাষায়, 'দেশভাগের কথা ভোলা খুব কষ্টকর, কিন্তু তা মনে করাও আতঙ্কের বিষয়।' তবে, দেশভাগের ভয়ঙ্কর স্মৃতির মধ্যেও ভেসে ওঠে শরতের শিউলির মতো স্নিগ্ধ মানবিকতার স্মৃতি, যার সংখ্যা কম হলেও বিরল নয়। কিছু স্মৃতিকথায় মেলে তার মনোজ্ঞ দৃষ্টান্ত, যেখানে দেখা যায়, যখন মানুষের মধ্যে অমানুষ জেগে ওঠে, তখনও থেকে যায় কিছু মানুষ। দাঙ্গা, হিংসা, বীভৎসতার ভয়ঙ্কর স্মৃতির পাশাপাশি অনেকের মনে বার বার উঁকি দিয়েছে ফেলা আসে জন্মভিটের স্মৃতি, যা একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার উৎস।

বাঙালির দেশভাগ নিয়ে কয়েকটি মহাভারত লেখা হতে পারতো, সেগুলোর মধ্যে নারী নির্যাতিত, অত্যাচারিত এই কথাগুলোই যেনো বারবার একতারাতে গান হয়ে বাজে। নারী জীবনে, মননে, স্বত্তায় দেশভাগের প্রভাব অস্বীকার না করেও আমরা কি এটাও ভাবতে পারি না যে দেশ ভাগের শুধুমাত্র নেতিবাচক নয় কিছু ইতিবাচক প্রভাবও নারীজীবনে পড়েছিল। দেশভাগের পরিণতি শুধুমাত্র কিন্তু একপেশে করুণ ছিলনা, এটা নারীর রোজনামচা, সামাজিক অবস্থান, পেশার ধরণ বদলে দিয়েছিল। আমি আমার প্রবন্ধটির মাধ্যমে নারীর একপেশে করুণ কাহিনী ব্যতীত স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ ভারতবর্ষ জুড়ে এক অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। হিন্দুদের জন্য ভারত আর মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান-এমন ধারণা ও সিদ্ধান্ত কয়েক কোটি মানুষকে বাস্তুচ্যুত করেছিল।(২) দাঙ্গা ও হানাহানিতে নিহত হতে হয়েছিল হাজার-হাজার অসহায় মানুষকে। নারী ও শিশুকে। যে কোনো যুদ্ধ ও দাঙ্গায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নারীরা। ১৯৪৭-এর দেশভাগের সময়েও প্রচুর নারীকে নির্যাতিত হতে হয়েছিল প্রতিপক্ষের হাতে। শত শত বছর একই সাথে বসবাস করা মানুষগুলো রাতারাতি কীভাবে হিংস্র দানবে রূপান্তরিত হয়েছিল তা দেখে শুধু শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী নয় সদ্য ভারত ত্যাগী ব্রিটিশরাও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত, দেশভাগের আগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক অনেক ক্ষেত্রেই পৌঁছে গিয়েছিল আত্মীয়তার পর্যায়ে। সেই মানবিক সম্পর্কের স্মৃতি বারবার নাড়া দিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে চলে আসা মানুষের হৃদয়কে। নানা মানুষের স্মৃতিকথা, সমকালীন পত্রপত্রিকা এবং সাহিত্য থেকে উঠে আসে দেশভাগের আগের এক নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা, অন্যদিকে এক ভিন্ন সামাজিক বিন্যাসের ছবি, যা ঐতিহ্যগত ভাবে শিকড় চালিয়ে দিয়েছিল পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য-জীবনে। ফলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গড়ে উঠেছিল সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ ও পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক। উভয়ে বাঁধা পড়েছিল আত্মীয়তার বন্ধনে। কিন্তু বহুকাল ধরে তিল তিল করে গড়ে ওঠা এই সুসম্পর্কের ছবিটা ঝলসে গিয়েছিল

রাজনীতির আঁচে। রাজনীতিবিদরা কেবল দেশকে ভাগ করেননি, করেছিলেন মানুষকে, মানুষের হৃদয়কে, ভাবনাকে। বাঙালি জাতিকে দুটো সম্প্রদায়ে ভাগ করে সেদিনের তথাকথিত দেশহিতৈষীরা পূর্ববাংলা থেকে যে উদ্বাস্তুস্রোতের ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁদের জীবনে অকল্পনীয় যন্ত্রণা ও বেদনা সৃষ্টি করেছিলেন, তা ভুলতে চেয়েছিলেন অনেকেই। কারণ, বিস্মৃতি দিয়ে হৃদয়ের ক্ষতের উপশম করা যায়।(৩) সকলের পক্ষে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। দেশের স্মৃতি, বিচ্ছেদের বেদনা অনেক মানুষকে তাড়া করে বেড়িয়েছে আমৃত্যু। অনেকের কাছে সময়টা থমকে গিয়েছিল ১৯৪৭-এ, যে বছরের এক পিঠে ছিল স্বাধীনতা, অন্য পিঠে দেশভাগ। নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল, দেশভাগের অনিবার্য পরিণতির বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই, তা সেই বাস্তব যতই বেদনার হোক না কেন।

নারীবাদী লেখিকা উর্বশী বুতালিয়া বলেছেন, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময়কার সহিংসতা বুঝতে হলে জানতে হবে নিজের পরিবারেই কতটা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন নারীরা। ওই সময় নিজের পরিবারের নারীকে হত্যা করেছে মানুষ। দেশভাগের সময়কার হিংস্রতা বোঝার জন্য তথ্য পাওয়া যায় খুবই কম। ভারত ভাগে সবচেয়ে বেশি দাম দিতে হয়েছে পাঞ্জাব, বাংলাকে। কারণ এ দুইটি প্রদেশও বিভক্ত অর্থাৎ ভাগ হয়ে পড়েছিল দুই দেশে। বাপ-দাদার ভিটেমাটি ছেড়ে এপার থেকে ওপারে, ওপার থেকে এপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে লাখ লাখ মানুষকে। এদের অনেকেই হয়ে পড়েছিলেন ঠিকানাহীন। এক কোটিরও বেশি মানুষ বাস্তুহারা হয়ে পড়েছিল।(৪) লাখ লাখ মানুষের জীবনযাত্রা পাল্টে গিয়েছিল। অনেকে রাতারাতি রাজা থেকে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল মানবতা। সে লাঞ্ছনা, অত্যাচার আর ভয়াবহ নির্যাতনের ক্ষত এখনো শুকায়নি পাঞ্জাব ও বাংলার জনগণের মন থেকে। সেই অসভ্যতা, বন্যতা চিরস্থায়ী ক্ষত রেখে গেছে এ দুই জনপদে। সেসময় প্রতিপক্ষের নারীদের ধরে এনে ধর্ষণ করা হতো। তারপর তাদের পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হতো। তিনি বলেন, দেশভাগের সময়কার ইতিহাস গবেষণার জন্য বৃত্তি বরাদ্দ থাকলেও এখনো অনেক বিষয় আড়ালেই রয়ে গেছে। দেশভাগের সব বিষয় তুলে ধরে এমন কোনো বই নেই। যে বইগুলো পাওয়া যায় সেগুলো দেশভাগের কোনো বিশেষ অংশ নিয়ে লেখা। অনেক সময় বইয়ের সমালোচকরা বিষয়টি এড়িয়ে যান। উপমহাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটা - ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগ। ভারত আর পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার ঠিক দুদিন পরে যে রিফিউজি কলোনি বা শরণার্থী শিবিরগুলির পত্তনের পরে কেটে গেছে অনেকগুলো দশক।মে রাডক্লিফ লাইন টেনে উপমহাদেশের মানচিত্র চিরতরে পাল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল- তাতে একদিকে যেমন কোটি কোটি মানুষ নিজের দেশ পেয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিলেন, অন্যদিকে

কয়েক লক্ষ মানুষকে হারাতে হয়েছিল নিজের দেশ, নিজের ভিটেমাটি। যেসময়ে সারা ভারতে চলছে স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ-উদ্দীপনা, সেই সময়ে পূর্ববঙ্গের নানা জেলায় শুরু হয়েছিল অনিশ্চয়তা আর অশান্তি।(৫)রিফিউজি কলোনি বা শরণার্থী শিবিরগুলির পত্তনের পরে কেটে গেছে অনেকগুলো দশক, বর্তমানে অনেক কলোনির নাম পরিবর্তিত হয়ে কলোনি শব্দটি হয়তো বাদ দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু তার জন্য দেশভাগের ফলে প্রাপ্ত যন্ত্রনা স্বরূপ দগদগে চিহ্ন রয়ে গেছে।

দেশভাগ নিয়ে আলোচনা বাংলায় প্রথমদিকে একটু কমই ছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন, এটা সাময়িক একটা ব্যবস্থা মাত্র, অচিরেই সব মিটে যাবে। পুরাণ অনুসারে একভাগ অমৃতের সাথে গরল উত্থিত হবার ন্যায় দেশভাগেরও ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক বিদ্যমান। স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে দেশভাগের দরুণ পরাধীনতা-শৃঙ্খলামুক্তির সাথে সাথে বাঙালির ভাগ্যে জুটেছিল দেশের অঙ্গবিচ্ছেদ। দেশভাগের ফলে একটি জাতির যে বৃহত্তর অংশ বিশেষভাবে যন্ত্রনার শিকার হয়েছিল তারা হল নারীসমাজ। দেশভাগের ফলে বাংলার পূর্ব থেকে পশ্চিমে উদ্বাস্তু মানুষের যে ঢল নেমে আসে, যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনবসতির ধাঁচে একযুগান্তকারী পরিবর্তন আসে, তাতে বাঙালি মেয়েদের জীবনে এক বিরাট বড় পরিবর্তন ঘটে যায়।(৬) এই পরিবর্তনকে পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে কেননা অবশিষ্ট সমাজের মধ্যে মিশে থাকলেও এ সময় নারীসমাজের পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি একেবারেই বিশিষ্ট ছিল। দেশভাগের পরবর্তী ইতিহাস শুধুমাত্র পূর্ববাংলার মেয়েদের ইতিহাস নয়, পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের জীবনও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হচ্ছিল। কোন কোন পরিবর্তন দৃশ্যতই ইতিহাসকে ধারণ করে। ওপারের নারীরা শুধুমাত্র এপারে আসেননি, বদলে দিয়েছে, বদলাতে বাধ্য করেছেন এপারের নারীদেরও।

মিহির সেনগুপ্তের বিষাদবৃক্ষ, সুনন্দা শিকদারের দয়াময়ীর কথা এবং সীমা দাশের দ্যাশ থেকে দেশে- এই তিনটি স্মৃতিকথারই লেখক-লেখিকারা হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধি এবং তিনটি রচনারই মূল সুর একটাই, দেশভাগ না হলেই ভালো হতো। কিন্তু একথা তো ঠিক, পূর্ববাংলার দরিদ্র মুসলিম কৃষকরা সর্বামত্মঃকরণে দেশভাগ চেয়েছিলেন। পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের তাঁদের কাছে কোনো তাৎপর্য ছিল না। তাঁরা ভেবেছিলেন, পাকিস্তান হলে বুঝি জমিদারি উচ্ছেদ ও তাঁদের দারিদ্র্যের অবসান হবে। অর্থাৎ কৃষকদের বিদ্রোহের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল পাকিস্তানপ্রাপ্তি। এর জন্য কৃষকদের দায়ী করা যায় না, দায়ী হলো তারা – যারা কৃষকদের সামনে সেই মরীচিকা তুলে ধরেছিল। দেশভাগ হলো আসলে সেই মরীচিকার কাহিনি আর ওপরে বর্ণিত স্মৃতিকথাগুলো হলো তার উপকাহিনি বা শাখা-প্রশাখামাত্র। আমাদের প্রার্থনা ও লক্ষ্য হওয়া উচিত এহেন মরীচিকার মায়াজালে জড়িয়ে হিন্দু বা মুসলিমরা যেন আর বিপথগামী না হয়।(৭)

দেশভাগের আলোচনায় মেয়েদের প্রসঙ্গ সাধারণভাবে ব্যক্ত হয় তাদের যন্ত্রণা, অসহায়ত্ব ও নানারকম দুর্ভোগের নিরিখে। অথচ, অশ্রুকুমার সিকদার দীর্ঘ আলোচনায় দেখিয়েছেন উদ্বাস্তুজীবন কীভাবে বস্তুত মেয়েদের সামনে মুক্তির পথ খুলে দেয়। যে-সব হিন্দু মেয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসেন, বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই তাঁদের জীবনে অনেক প্রথাগত সংস্কার শিথিল হয়ে আসে। আবার অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে সম্পন্ন ও শিক্ষিত অনেক মুসলমান মহিলা পূর্ববঙ্গে চলে যাওয়ায় নেতৃত্বহারা এখানকার মুসলমান মেয়েরা অনেকটাই অনগ্রসর থেকে যায়। দেশভাগ নারীজীবনে অবশ্যই করুণ, যন্ত্রণা, ট্রমার এক অধ্যায়, কিন্তু প্রত্যেক বৃহত্তর ঘটনারই নেতিবাচক দিকের পাশাপাশি স্বল্প পরিসরে হলেও ইতিবাচক প্রভাবও থাকে। ইতিবাচক দিকের মধ্যে অন্যতম ছিল মেয়েদের জীবিকার তাগিদ, যা মূলত এসেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে আগত নারীদের সংসার চালানোর তাগিদ থেকেই। আবার একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের জীবনে ও সংসারের দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়ার তাগিদ দেখা দিচ্ছিল, যার পরিণতি ছিল অল্পসংখ্যক হলেও কিছু মেয়েদের জীবিকার সাথে যুক্ত হওয়া। এই জীবিকার মধ্যে বিশেষভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার নিযুক্তির সংখ্যাই বেশি ছিল। এর দরুণ মেয়েদের মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার আগ্রহ ও প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাছাড়া অভিনয়ের জগতেও মহিলাদের প্রবেশ যথেষ্ট ছিল এই সময় - নাটক, থিয়েটার। যদিও সমাজ মেয়েদের এই পেশাকে তখন বাঁকা চোখেই দেখতো, কিন্তু ক্রমে বদল আসছিলো।(৮) যারা জীবিকার সাথে যুক্ত ছিলেন না তারাও কিন্তু ক্রমে আধুনিক হচ্ছিলেন, নভেলপড়া, বায়োস্কোপদেখা, পোশাকেও পরিবর্তন আসছিলো। যেসব নারীরা লেখাপড়া পরিস্থিতি ও পারিবারিক কারণে শিখতে পারেননি তারা সে সময় তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে এটা বলা যায় যে দেশভাগের ফলে অল্পসংখ্যক হলেও এপার ও ওপার থেকে আগত নারীরা নিজ আগ্রহে ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে স্বনির্ভর হওয়ার দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিল। অতএব দেশভাগের ইতিহাসের অর্থই সর্বদা নারীর যন্ত্রণার ইতিহাস ছিল না, ছিল স্বল্প পরিসরে ধীরে ধীরে অর্থেক আকাশ হয়ে ওঠার কাহিনী। দেশভাগের ইতিহাস নিয়ে রচিত বহু কাহিনী আলোচনায় আসতে পারে। ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার সময়েও দ্বিজাতি-তত্ত্বের শেষ পেরেকটা পুঁতে দেয় দেশের মেরুদণ্ডে। প্রাপ্তির ভাঁড়ারে – দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। ভারতের স্বাধীনতার আনন্দকে দেশভাগের যন্ত্রণা বহুলাংশে ম্লান করে দেয়। পরিশেষে দেশভাগ কিন্তু মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়কেই ছুঁয়ে থাকে। দাঙ্গা, উদ্বাসন, হিংস্রতার বিবরণ তিনি একথা দিয়েই শেষ করেন যে, ভারতীয় উপনিবেশের ইতিহাসে দাঙ্গাবিধ্বস্ত সমাপ্তিই একমাত্র সত্য নয়, দু'শো বছরের প্রতিরোধের ইতিহাস ও সমান সত্য এবং এই দুই সত্যের সমন্বিত স্মৃতির মধ্য থেকেই তৈরি হয়েছে এবং হবে ভবিষ্যতের রূপরেখা। যাঁরা 'বিষাদবৃক্ষ' পড়েছেন, তাঁরা আন্দাজ করে নিতে পারবেন মিহির

সেনগুপ্তের স্মৃতিচারণের অন্তরঙ্গ এবং বিষাদের সুরটি। সুনন্দা সিকদারের স্মৃতিচারণ যদি মনকে স্পর্শ করে, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভয়াবহ' স্মৃতিকথার স্মৃতিচারণ বা যতীন বালার উদ্বাস্তু ক্যাম্পের নরক যন্ত্রণার কথা পড়ে মনে হয় যে বিস্মরণেই মানুষের মুক্তি।(৯)

দেশভাগের দাঙ্গায় নারীদের প্রতি যৌন নির্যাতন নিয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। ভীষণভাবে হয়েছে ধর্ষণ, শিশুদের জ্বলন্ত তন্দুরে ফেলে হত্যা। যারা এই অপরাধ করেছে, তাদের বেশির ভাগ কিন্তু দাগি আসামী বা যৌন অপরাধী ছিল না। দেশভাগের আগে মোটামুটি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন এরা। পরেও হয়তো ফিরে গিয়েছেন স্বাভাবিক জীবনে। মনোবৈজ্ঞানিকরা যৌনতার সঙ্গে হিংস্রতার সম্পর্ক নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। দেশভাগের হিংসার গভীর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। এই গভীর সমস্যার সমাধান সম্ভব যুক্তিনির্ভর বোঝাপড়ার মাধ্যমে। দেশভাগের পর তৃতীয় প্রজন্ম এসে গেছে, এবার আমরা একসাথে সুস্থ ভাবে বাঁচার অঙ্গীকার বদ্ধ হওয়া উচিৎ। বৃহত্তর অংশে প্রভাব জনমানসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়, সেদিক থেকে দেশভাগের নেতিবাচক ও নারীদের যন্ত্রণার কাহিনী এতোটাই বেশি ছিলো যে নারীদের একাংশের স্বাধীন মনস্কতা ও জীবনধারণের ইতিহাস অনেকক্ষেত্রে ম্লান হয়ে যায়। তবে অস্বীকার করার কোন জায়গায় নেই যে দেশভাগের ইতিহাস অনেকাংশেই ছিল যন্ত্রণার ইতিহাস।(১০) সর্বশেষে এটাই বলতে চাই দেশভাগের নারী নির্যাতনের করুণ কাহিনী না হয় স্মৃতির গহ্বরে আবৃত থাকুক, তার পরিবর্তে আলোচিত হোক নারীর দীর্ঘ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে লড়াই করে স্বনির্ভর হওয়ার ইতিহাস যা পরবর্তী প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মানবেতিহাসের অন্যতম বৃহত্তম স্থানচ্যুতি ও উদ্বাস্তু সঙ্কট ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের এই দেশভাগ ঘটনায়। অন্তত কুড়ি লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন — যে সংখ্যা অবশ্যই সরকারি, তদুপরি আনুমানিক। প্রায় এক লক্ষ মহিলা শারীরিক ভাবে নির্যাতিত ও ধর্ষিত হয়েছিলেন। উর্বশী বুটালিয়া প্রমুখ গবেষক দেখিয়েছেন কী ভাবে নারীশরীর হয়ে উঠেছিল দেশভাগ-ভয়াবহতার প্রধান মঞ্চ, তাঁদের জীবিত বা মৃত শরীরে এঁকে দেওয়া হয়েছিল বিজেতার অভ্রান্ত চিহ্ন। এত পরিমাণ নারীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার নিদর্শন এই উপমহাদেশের ইতিহাসে আর কখনও ঘটেনি, অন্য দেশের ইতিহাসেও নয়। নাৎসি জার্মানির যে ইহুদিনিধনের ভয়াবহতা সমস্ত বিশ্বকে আজও কাঁপিয়ে দেয়, ভারতীয় উপমহাদেশের দেশভাগের বীভৎসতা তার তুলনায় আকারে ও প্রকারে কিছুমাত্র কম নয়- নির্যাতিতের সংখ্যা আরও অনেক গুণ বেশি।(১১) দেশভাগের প্রাপ্তিস্বরূপ নারীর এই চরম যন্ত্রণার সামনে ক্ষীণ আলোকশিখার ন্যায় তার স্বাধীন হয়ে ওঠার ইতিহাস হয়তো খুব সামান্য কিন্তু তাও এতো যন্ত্রণার মধ্যেও এই স্বাধীনতা কিছুটা হলেও দেশভাগ পরবর্তী নারীদের জীবনে এক টুকরো হিমেল হাওয়ার প্রতিভূ স্বরূপ।

তথ্যসূত্র

১. ঘোষ, সেমন্তী, দেশভাগ: স্মৃতি আর স্তব্ধতা, গাংচিল, ২০০৮, পৃষ্ঠা: ১২-২৩।
২. পাল,মধুময়, দেশভাগ: বিনাশ ও বিনির্মাণ, গাংচিল, ২০১১, পৃষ্ঠা: ১-৫।
৩. বসু, জ্যোতির্ময়, সাতচল্লিশের দেশভাগ, জাতীয় সাহিত্যপ্রকাশ, ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৩০-১৩৫।
8. Chatterjee, Joya. The spoils of partition Bengal and India 1947-1967, Cambridge University Press, 2007, Page: 1-15.
৫.বন্দ্যোপাধ্যায়,আলাপন,দেশভাগ৭৫: বোঝাগেল, আঘাতদূরপ্রসারী, আনন্দবাজার অনলাইন, ২০২২।
৬. চক্রবর্তী, প্রফুল্ল কুমার, প্রান্তিক মানব (পশ্চিমবঙ্গেউদ্বাস্তুজীবনেরকথা), প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭,পৃষ্ঠা: ৬৫-৭০।
৭. বন্দোপাধ্যায়, হিরন্ময়, উদ্বাস্তু, সাহিত্যসংসদ, ১৯৭০, পৃষ্ঠা: ৪১-৫০।
৮. বন্দোপাধ্যায়, সন্দীপ, দেশভাগ: স্মৃতিআরসত্তা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৯।
৯. Menon, Ritu & Bhasin, Kamla. Borders and Boundaries: women in India's Partition, Kali for women, 1998.
১০. আলমগীর, শাহরিয়ার, দেশভাগ: ইতিহাসের বিস্মৃতি ও বেদনার আখ্যান, দ্য ডেইলি স্টার, ২০২১।
১১. Butalia, Urvashi. The other side of silence: Voices from the Partition of India, Penguin Random House, 2017.

সহযোগী গ্রন্থসমূহ:
১. বসু, দক্ষিণারঞ্জন, ছেড়ে আসা গ্রাম, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০২০।
২. Butalia, Urvashi. The Persistence of Memory, Harper XXI, 2015.
৩.ঘোষ, বুদ্ধদেব, বিশ্বাস, দেবব্রত(সম্পাদনা), সাতচল্লিশের দেশভাগ, কথাপ্রকাশ, ২০২১।
৪. চট্টোপাধ্যায়, সাধন(সম্পাদনা), দেশভাগের গল্প: রক্তবেদনা ও স্মৃতির আলেখ্য, গাঙচিল, ২০১৬।